International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-II, September 2015, Page No. 1-8
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র (বিবিধ সমালোচক-গ্রন্থের আলোকে)

ড. বিকাশ রায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

Literary criticism includes two dimensions—the first is of theory, and the second is about its application. The first one, i.e. the theoretical dimension is always considered to be the "Literary theory" or "literary philosophy". Professor Bhabatosh Dutta once opined, "Bankim Chandra is the pioneering figure to talk about the literary theory in Bengali literature." The literary criticism of Bankim Chandra Chatterjee, in one way is the criticism of life. And the main essence of his criticism is to meditate on the issue of amelioration of human condition through the ideals of beauty. The literary criticism of Bankim Chandra is considered as The Republic of literature. Bankim Chandra embraced the poetics of the Western world instead of the 'rasa theory' imagined by the aesthetes of ancient Indian kāvya poetry. Formalist criticism, Genre Criticism, Archetypal Criticism, Historical Criticism, and Interdisciplinary Criticism are main schools of the whole discourse of literary criticism. Bankim Chandra's "Bibidha Samalochona" (1876) a collection of nine essays namely: Uttar Charit, Geeti kavya, Bidyapati Joydev, Aryajatir Shukkha shilpa, Shakuntala-Miranda-Desdemona, Prakrita-Otiprakrita, Krishna Charit, Droupadi, Sekal ar Ekal. The present paper aims to evaluate Bankim Chandra as theorist and critic by keeping this book in the forefront.

Key Words: Literary criticism, theoretical dimension, Literary theory, literary philosophy, Bankim Chandra Chatterjee

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' গল্পে হৈমবতী— 'বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িতে চায়' বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কেউ বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধ পড়তে চায় কিনা এরকম নজির কোনও আখ্যান কথকের মুখে শুনি না। তথাকথিত মনোযোগী পাঠক কতটাই বা পড়ে বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধ সে নিয়েও কোথাও একটা সংশয় দানা বাধে। কেননা, প্রখ্যাত বঙ্কিম জীবনীকার ও সমালোচক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য যখন আমাদের শোনান— "... আজও পর্যন্ত বঙ্গদেশে ... তাঁর সমগ্র রচনা সংগ্রহ করে, প্রতিটি গ্রন্থের সকল সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করে ... প্রকাশিত হলো না একটি আদর্শ প্রামাণিক বঙ্কিমরচনাবলী।" বঙ্কিমচন্দ্রের সমসময়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী কতটা কদর পেয়েছিল তা অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের বাচনেই স্পষ্ট করে প্রতিভাত হয়— 'প্রবন্ধ লিখে মৌলিক সাহিত্যিক বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার অপব্যয় করেছেন।' আবার প্রমথনাথ বিশী-র মতো প্রাজ্ঞ চিন্তকেরা মনে করেন— "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি অনেক পরিমানে অবহেলিত, তার কারণ অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ... তাঁর প্রবন্ধে অবহেলার একটি লৌকিক কারণ আছে, প্রবন্ধগুলি বিষয় অনুসারে সজ্জিত হয়ে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না। এভাবে পাওয়া গেলে প্রবন্ধগুলোর আদর বাড়বে বলে আশা হয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের ১৭৫-তম বর্ষ অতিক্রান্তিতে আমরা পরিপূর্ণ, সুচারু এবং পরিমার্জিত সন তারিখের ক্রম অনুযায়ী প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ করতে পারলাম না, এ বড় আক্ষেপের ও পরিতাপের বিষয়, বাঙালির বিস্মৃতি-প্রাণতার চরমতম দৃষ্টান্ত। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধের সমাহারে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় 'বিবিধ সমালোচনা। তারপরে ১৮৭৯ সালে দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে বের হয় 'প্রবন্ধ পুস্তক'। পরবর্তীতে এই বই দুটির কিছু প্রবন্ধকে পরিমার্জন ও পরিবর্তন করে ১২৯৪ সনে 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯২) সংকলিত হয় ধর্ম, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য রচনাদর্শ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় 'বিবিধ সমালোচনা গ্রন্থটিকে সামনে রেখে বঙ্কিম মানস বা সমালোচক ও সাহিত্য-তাত্ত্বিক বঙ্কিমের চিন্তা বিশ্বের অনুসন্ধান করা। তার আগে বাংলা সমালোচনার ইতিহাসে ও বাঙালির তাত্ত্বিক ভাবনা পরিসরে বঙ্কিম মনীষার অবস্থান ও বিশেষত্বকে একবার দেখে নেওয়া থাক।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক ও ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছিলেন—

> "নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনও একজন বিশেষ মনীষার মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত সংস্কার থেকে দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।"

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের আগে বাংলা সাহিত্যের ভাব ও ভাষার শ্রীহীন বা লক্ষ্যভ্রষ্ট অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রকে এক মানসিক কষ্টে রাখত। একদিকে পুরনো মানসিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবের গতি পরিবর্তনকে মানতে পারত না, আবার অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা অন্ধভাবে পাশ্চাত্য মতাদর্শে আচ্ছন্ন থাকত— এই অবস্থায় সাহিত্য সংস্কার ও সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে নিজের অনুভূতি উপলব্ধি ও সাহিত্যদর্শের একটা মডেল উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই 'বঙ্গদর্শন' হয়ে উঠেছিল ইতিহাস চর্চা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও বাংলা সাহিত্য সমালোচনার একটা বড় প্ল্যাটফর্ম। আর এই ১৮৭২ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচক ও সাহিত্য তাত্ত্বিক হওয়ার কাল পর্ব। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন— "বিষয় অনুসারেই রচনা ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।" এই 'রচনার ভাষার উচ্চতা' এবং 'সামান্যতা' নির্ধারণ করতে বঙ্কিম গভীর অধ্যয়নে ব্যস্ত থেকেছেন, পৌঁছেছেন ভাবনার পরিপূর্ণতায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন বিষয়ে বিচিত্র প্রবন্ধ লিখেছেন। যা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এবং ভাষায় ব্যক্ত হয় এভাবে—

> "বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লক্ষ্যে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠন কার্যে এক হস্ত নির্মান কার্যে যুক্ত রাখিয়াছিলেন। ... রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্ত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

'এই রচনা' ও 'সমালোচনা'-র দায়িত্ব নিয়ে বঙ্কিম এক বিশেষ ধারার প্রচলন করলেন। যা পরবর্তীতে আমাদের কাছে 'সমালোচনা সাহিত্য' নামে পরিচালিত হল। এই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সমালোচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বঙ্কিম লিখলেন —
"সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোনো কার্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য।" (বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৭৯)

সাহিত্য সমালোচনার দুইটি দিকের সঙ্গে আমরা মুখোমুখি হই-প্রথমটি তত্ত্বের দ্বিতীয়টি প্রয়োগের। তত্ত্বের রূপটিকেই আমরা 'সাহিত্য দর্শন' বা 'সাহিত্য তত্ত্ব' বলে চিহ্নিত করি। অন্যটি ব্যবহারিক সমালোচনা যাকে Practical Criticism বলি। সাহিত্য সমালোচনার মূলসূত্র গুলি এই সাহিত্য তত্ত্বেই বিবৃত হয়ে থাকে। সমালোচনার ভাবগত ঐক্যে থাকে সাহিত্য তত্ত্ব, সমালোচনা তত্ত্ব ও ব্যবহারিক সমালোচনার নানা দিক নির্দেশক বয়ান। আসলে, সাহিত্য তত্ত্ব বিশেষ চিন্তামূলক ব্যাপার। অষ্টাদশ শতকে আলেকজান্ডার বম গার্টেন নামক শিল্পতাত্ত্বিক 'Literary Theory' বা সাহিত্য তত্ত্ব নামক সংরূপটির আবিষ্কর্তা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চিন্তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ১। সাহিত্য তত্ত্ব, ২। প্রাচীন সাহিত্য, ৩। আধুনিক সাহিত্যিক। এই তিন স্তরেই আছে সাহিত্য তত্ত্বের প্রগাঢ় ছায়া। চিন্তাকে তত্ত্বে রূপান্তরিত করা। আবার তত্ত্বকে ভাবনার উচ্চতা ও ঘনত্ব দিয়ে একটা সূত্রে পৌঁছে দেওয়ায় মনীষার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। বঙ্কিমের হাতেই চিন্তা তত্ত্বে এবং তত্ত্বসূত্রে বিকশিত হয়ে উঠে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত যথার্থই বলেছেন — "সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে গভীর আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম করেছিলেন একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।" (বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা, পৃঃ ১১২)

বঙ্কিমের সাহিত্য সমালোচনা এক অর্থে জীবন সমালোচনাই বটে, কারণ জীবন ছাড়া সাহিত্য অচল। আর এই সাহিত্য সমালোচনার ধ্রুবপদ হল সৌন্দর্যের মাধ্যমে মানুষের মাঙ্গলিক চিন্তা। তাছাড়াও বঙ্কিম দর্শনের মূল তত্ত্বকথা মানবিকতার পাঠ বা সন্ধান। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনার মূল ভরাকেন্দ্রে থাকে সমাজ। তাঁর কাছে বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য বিচার অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব দাঁড়িয়ে থাকে ব্যাখ্যার পারস্পর্য সূত্র কাঠামোর উপর। বিজ্ঞানের যুক্তি নিষ্ঠা ও সাহিত্যের অনুভূতি দুটোকেই কিভাবে জুড়ে দেন, তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি —

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জলবাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানি কারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিনী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা বাঙ্গালীর পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখ-পরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতি কাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত-আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের হত বাহুল্য। (বিদ্যাপতি ও জয়দেব)। কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক বিচার করছেন এই প্রবন্ধের শেষ দিকে, কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে

যথার্থ সম্বন্ধ এই যে উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয় - উভয় উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। সমাজকে প্রত্যক্ষে রেখে সমালোচনা সৃষ্টির চমৎকার উদাহরণ, ভূগোল, ইতিহাস দেশের জলবায়ু কিভাবে সাহিত্যের ধারাকে সৃজিত করে, পুষ্ট করে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের আবার বলেন —

> "যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বটে। তাঁর মতে জয়দেব ও ভারতচন্দ্র ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ।"

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত অনুভূতি ও রসবোধকে অবলম্বন করে উপলব্ধিকে সচেতন চিন্তার ক্ষেত্রে এনে তাকে তত্ত্বে এবং শেষ পর্যন্ত সূত্রে পরিণত করেন। ভারি চমৎকার কথা শুনিয়েছেন প্রাজ্ঞ সমালোচক প্রমথনাথ বিশী —

> "বঙ্কিমচন্দ্র নির্মাণ করেন সমালোচনার প্রশস্ত ও সুগম রাজপথ, যে কোন পথিক ইচ্ছা করলে অনায়াসে তাতে বলতে পারে। ... বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা সাহিত্যের রিপাবলিক, রবীন্দ্রনাথের বেনেভোলেন্ট অটোক্রেসী।" (সাহিত্য চিন্তা, পৃঃ ২৮)।

চিন্তার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আশ্রয় সমালোচনা, আর প্রকাশের মাধ্যম সাহিত্য। সমালোচনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিকটি অ্যারিষ্টটলের পোয়েট্রিক, সমালোচনার সাহিত্যময় দিকটি গ্যেটেকৃত হ্যামলেটের আলোচনা। সাহিত্য-সমালোচনা যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সমন্বিত রূপ, তারই সন্ধানে স্যাঁৎবুভের ও ম্যাথু আরনল্ডের রচনায়। বিজ্ঞান ইনফরমেশন থেকে প্রমাণ ও যুক্তি খুঁজে নিয়ে ধীরে ধীরে তত্ত্বে পৌঁছায়, গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে কয়েকটা স্টেপ পেরুতে হয়। এই স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কত সহজে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেখানে কথার বাহুল্য নেই, আছে শুধু সূত্র। যে সূত্র ধরে পাঠকও পৌঁছে যান নিজস্ব সিদ্ধান্তে, এমনই একটি উদাহরণ 'গীতিকাব্য'- প্রবন্ধের অংশ বিশেষে দৃষ্টি প্রক্ষেপনে আমন্ত্রণ জানাই —

> "যখন হৃদয় কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ কি শোক কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদার অংশ কখনো ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, আদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছাসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষগুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত । মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।"

মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও পার্থক্য প্রতীতি কত সহজ কথায় কত দ্যোতনাময় সংকেতে বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরলেন যেখানে কথার বাহুল্য দৃশ্যমান হয় নি; পাঠককে কেবলমাত্র সূত্রধরে সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে অগ্রসর হন।

আবার যখন উনিশ শতক বিষয়ে পারদর্শী পন্ডিত প্রবর অধ্যাপক অলোক রায় শোনান —

> "আধুনিককালে আমরা যাকে সাহিত্যতত্ত্ব বলি, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ঠিক সেই ধরনের তত্ত্বভাবনা দেখা যায় না। অনেকে সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্য-সমালোচক বলেছেন, কিন্তু তাঁকে সাহিত্য তাত্ত্বিক বলতে রাজি হননি। অথচ তাঁর 'উত্তর চরিত' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন, ১২৭৯) প্রবন্ধে বিশেষ কাব্য অবলম্বনে তিনি সহজেই নির্বিশেষ তত্ত্বে পৌঁছে যান।" (বঙ্কিম-মনীষা, পৃঃ ৯০)।

কি সেই নির্বিশেষ তত্ত্ব, প্রবেশ করা যাক পাঠকৃতিতে —

> "এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। ... কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগর-মাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের এই স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে, প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর-গৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্যনাটক সমালোচনাও সেইরূপ।"

সামগ্রিক বিচারের দৃষ্টিকোন থেকে সমালোচনা করতে গিয়ে সাহিত্য তত্ত্বে ঢুকে পড়লেন বঙ্কিমচন্দ্র। তত্ত্বগত অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নয়। সমালোচনা করতে গিয়েই এসে গিয়েছে নানা তাত্ত্বিক মীমাংসার সংকেত বিন্দু। 'সাহিত্য বিজ্ঞান' গ্রন্থের ভূমিকাতে 'বিচার' করবার প্রয়াসে তত্ত্বে প্রবেশ করতে মোহিতলাল আগ্রহী হয়েছেন —

> "সাহিত্যের আসর নামক প্রবন্ধটিতে সাহিত্য বিচারের কয়েকটি মূলতত্ত্ব একটু সরল ও সহজ ভঙ্গিতে আর একদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।"

এখন আমাদের প্রশ্ন জাগে। সাহিত্য-সমালোচনাও সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? সমালোচনার কাজ যদি হয় সাহিত্যের মূল্য নিরুপণ বা আনন্দমূল নির্ধারণ, তার পদ্ধতি যদি হয় টি.এস. এলিয়ট কথিত Cementation exposition ও interpretation বা সোনা কথায় - ব্যাখ্যা, রস নির্ণয় এবং মূল্য বিচার, সাহিত্যতত্ত্বের সহজ পাঠে থাকে সেই একই পদ্ধতি, সাহিত্য তত্ত্ব সন্ধান সাহিত্য-সমালোচনারই একটা অংশ। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা শুরু করেছিলেন 'বঙ্গদর্শন'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে আর পুস্তক সমালোচনা শুরু করেন সপ্তম সংখ্যা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে —

> "গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা, গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন সেখানে ভ্রম সংশোধন করা, যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা, এই গুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য।" [বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (৮ম খন্ড), বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৭, পৃঃ ৩০৫, নূতন গ্রন্থের সমালোচনা, বিবিধ প্রবন্ধ]

উপরিউদ্ধৃত বক্তব্য থেকে বোঝাই যায়, বঙ্কিমচন্দ্র রস সম্ভোগ, জ্ঞানসঞ্চয় ও জনকল্যাণের দায়িত্ব সমালোচনার ওপরেই ন্যস্ত করেছেন। এই সূত্রেই বঙ্কিমের সাহিত্যতত্ত্বে এসেছে আধা ক্লাসিক, আধা রোমান্টিক দৃষ্টি প্রক্ষেপণ, সৌন্দর্য ও কল্যাণ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে অবস্থান করবার অনুশীলন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি চিহ্নিত করার আগে সাহিত্যতত্ত্বের বেসিক লক্ষণগুলো জানা দরকার। আঙ্গিকের প্রথম দরকার অন্তর্দৃষ্টি। এই দৃষ্টি বা দৃষ্টিকোনকে চারটি স্তরে আমরা বিন্যস্ত করতে পারি — ১। সাহিত্যের স্বরূপ লক্ষণ সন্ধানী মনন, ২। রচয়িতার 'Point of view', ৩। রসগ্রহীতা বা ভোক্তার পরিসর, ৪। সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক দৃষ্টিকোণ। সাহিত্য তাত্ত্বিক বঙ্কিমের কাছে — 'সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্য ও তাই।' সাহিত্য তত্ত্বে বঙ্কিম বিশ্বাস করেছেন - নীতিকথা, বস্তুতান্ত্রিকথায়, চিত্তশোধন প্রক্রিয়ায়, কল্যাণপূত কর্মে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রবন্ধগুলো সাহিত্যতত্ত্বমূলক, সেগুলি হলো — 'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। তাঁর তত্ত্বে খাওয়ার পদ্ধতি ইনডাক্টিভ তাঁর জীবন জিজ্ঞসা তথা তত্ত্বজিজ্ঞাসা এমপিরিসিস্টের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।

বঙ্কিমের প্রথম সাহিত্য-সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ 'উত্তর চরিত।' বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির 'উত্তরচরিত' নাটক অবলম্বনে উত্তর চরিত' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে সাহিত্য সৃজন শুধুমাত্র আনন্দই দেয় না, মানুষকে চিত্তশুদ্ধির স্তরেও নিয়ে যায় —

১। চিত্তশুদ্ধি : "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌন উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন-চিত্তশুদ্ধি জনন।" (উত্তর চরিত)। যে রচনা মানুষের চিত্তকে কলুষিত করে, বিভ্রান্ত করে, অসুন্দরের পৃথিবীকে আহ্বান জানায়, তা বর্জিত হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধেই আবার তিনি জানাচ্ছেন - কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা- কবিরা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। (উত্তর চরিত)

২। চিত্তবৃত্তি ও মনুষ্যহৃদয় : (ক) "মনুষ্যের কার্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণন দ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য।"

(খ) "কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। ... দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্য চরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারেনা।" (প্রকৃত এবং অপ্রকৃত)।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে স্পষ্ট ঘোষণা আছে "সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় বা মানবচরিত্র।" এই মানবহৃদয় বা মানব চরিত্র বোঝাতে বাংলা গীতিকাব্যের লেখকদের দুই দলে বিভক্ত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র —

> "একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া উৎপত্তি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্যপ্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট; আর একদল, আপনাদিকের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য চরিত্র খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করুণ।" [বিদ্যাপতি ও জয়দেব]

প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভালো, এই বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ সালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মানস বিকাশ' কাব্য সমালোচনায় 'মানস বিকাশ' নামে প্রকাশিত 'মানস বিকাশ'-এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ "বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি। লঞ্জাইনাস রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বে জোর দেন হৃদয় বৃত্তিতে। তিনি শোনান — "Our soul is instructively uplifted by the true Sublime me, it takes a proud flight, and is fitted with joy and vaunting as though it had itself produced what it was heard." উদাত্তভাবের দ্বারা আমাদের আত্মা ও মন উন্নত হয়।

৩। সৃষ্টিক্ষমতা ও সৃষ্টি চাতুর্য : বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য তত্ত্বের আলোচনায় কবির 'সৃষ্টি ক্ষমতা'র ওপর জোর দিয়েছেন — 'কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি ক্ষমতা। সে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। ... সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে।... কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।' (উত্তর চরিত) বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সৃষ্টি চাতুর্য্য'এর গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে লেখেন — 'যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বাভাবানুকারী, অথচ স্বাভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয়না।' বঙ্কিমচন্দ্র অ্যারিষ্টটলের মত 'অবিকলের' পরিবর্তে 'Probability and necessity' কেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন এই তত্ত্বগত ভাবনার অনুষঙ্গে। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি ইম্যানুয়েল কান্টের "Critique of judgment" গ্রন্থের বহুচর্চিত মন্তব্যকে - "A natural beauty is a beautiful thing; artistic beauty is a beautiful representation of a thing."

৪। রসোদ্ভাবন: বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব অনুযায়ী 'রস' শব্দটি বলতে চাননি, রসের পরিবর্তে 'রসোদ্ভাবন' শব্দটি ব্যবহার করতে আগ্রহী। তাছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের প্রত্যাখান করতেই বেশি উৎসাহী —

"এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জন করিয়াছি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল।" (উত্তরচরিত)।

আসলে বঙ্কিম প্রাচীন আলঙ্কারিকদের স্থায়ীভাবটিকেই কাব্যগত বিশ্লেষনে 'রসোদ্ভাবন' শব্দসামর্থে বোঝাতে চেয়েছেন।

নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম খন্ড, ১৮৭১, ২য় খন্ড ১৮৭৭) কাব্য সমালোচনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে 'গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য' হলেও রসোদ্ভাবনই যে বাক্যকে গীতের পর্যায়ে নিয়ে যায়। সে কথাই সোনার তত্ত্বগত ভাবনায় —

যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাব ব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। ... বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য। ... গীতিকাব্য লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার। (গীতিকাব্য : বিবিধ প্রবন্ধ)

৫। দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বন: টি.এস.এলিয়ট লিখেছিলেন — "Criticism must always profess an end in view which roughly speaking appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste" সমালোচনার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সবসময় থাকবে। সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখ থাকবে শিল্প ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও মানুষের রুচির উন্নয়ন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরীন একটা সম্পর্ক সব সময় থাকে। সমাজ বিজ্ঞানী বার্কলের চিন্তাজগৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে। বঙ্কিম লিখলেন —

"সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদ, রাজ্য বিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ বিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকার ভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।" (বিবিধ প্রবন্ধ : প্রথম ভাগ)

৬। লেখার উদ্দেশ্য: দেশ ও মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন — ভারতে আধুনিক জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক উৎস স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। 'অনুশীলন তত্ত্বে' বঙ্কিম ঘোষণা করেছিলেন — '... সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।' বঙ্কিমের ইতিহাস চেতনা রূপান্তরিত হয় তত্ত্ব কাঠামোয় 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিবিধিত্বমূলক চরিত্র হিসেবে বরণ করেন শ্রীকৃষ্ণকে। স্বদেশ নির্মান আর দেশকে শক্তিশালী করাই বঙ্কিমের জীবন সাধনার আর একটি দিক। সেই দৃষ্টিকোণের আভাস 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয় —

'--- সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। ... যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদ, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।' অয়াল্টার পেটার-এর মতোই বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যতত্ত্ব বা aestheticism-এর অনুযায়ী। ওয়াল্টার পেটার 'Renaissance' গ্রন্থে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন —

"The aesthetic critic then, regards all the objects with which he has to do all words of art and the fairer forms of nature and human life, and powers or forces producing pleasurable sensations each of a more or less peculiar or unique kind" আসলে সমালোচক বা তাত্ত্বিকের কাছে' সব রকমের আর্ট, প্রকৃতি ও জীবনের সবরকমের আকৃতিকে আনন্দ উদ্দীপকের চরম উৎস বলে মনে হয়। বঙ্কিমের কাছেও লেখার শেষ এবং চরম অভিপ্রায় মানুষের মাঙ্গলিক চিন্তা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির এষণা —

"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" (বাঙ্গালীর নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন / বিবিধ প্রবন্ধ)

৭। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মিশ্রিত রূপ : বঙ্কিমের সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুরু জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদ দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত ছিলেন। তাছাড়া কোৎ, বেন্থান, ডেইন প্রমুখ চিন্তকদের দর্শন প্রস্থানের দ্বারা বঙ্কিম অনেকটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এককথায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ভাবনায় অনেকটাই জুড়ে আছে পাশ্চাত্য অভিমুখীতা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে কবি হৃদয়ের যথার্থ আবেগই কবিতার অন্যতম শর্ত — If the function of a devout heart be wanting everything else is of no avail আবার তাঁর কাছে বিজ্ঞানের আবেগময়রূপ হল কাব্য — "the impassioned expression which is the countenance of all science" বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সমন্বিত রূপ ও কবিতার চিত্রিত ছায়ায় হৃদয়ের প্রতিবিম্বনকে খোঁজেন বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে —

"কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয় - উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি।" (বিদ্যাপতি ও জয়দেব)

৮। বঙ্কিম মানসে ঔপনিবেশিকতা- বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ভারতীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের রসতত্ত্বের ধারনাকে প্রত্যাখ্যান করে পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বের নিরিখে রসবাদে আস্থাশীল ছিলেন তাই নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারায় ভারতীয় সাহিত্যের পরম্পরাকে বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন —

(ক) "খন্ডকাব্যের মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রচার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপ গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিকের প্রয়োজন।" (গীতিকাব্য/বিবিধ প্রবন্ধ)

(খ) ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকে নাটক বলে না। উভয়দেশীয় নাটক-দৃশ্য কাব্য বটে, ইউরোপীয় সমালোচকরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন, (শকুন্তলা কাব্য)

আজ যেখানে Post-Colonial বা উত্তর — ঔপনিবেশিক তত্ত্বের নিরিখে মানুষের সার্বিক কল্যান সাধনের চেষ্টায় ব্রতী হতে বলা হচ্ছে। কিংবা এডওয়ার্থ সঈদ 'Orientalism' বা প্রাচ্যবাদে জোর দিচ্ছেন এমনকী আমাদের সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ সেই কবে আজকের প্রাচ্যবাদের জায়গা থেকে তাঁর বিভিন্ন সৃজনী ধারা নির্মাণ করে গেছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সব্যসাচী' বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাস অপেক্ষা শেক্সপীয়রকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন 'শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমোনা,' যা 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এখানেই থেমে থাকেননি প্রাবন্ধিক বঙ্কিম, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিম শোনালেন ইংরেজ জাতির সংগ্রামে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ব্রত বা অঙ্গীকারকে— "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখনও জানিতাম না তাহা জানাইতেছে; যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে।" বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বাঙালি চরিত্র নিয়ে খুব একটা গর্বিত হওয়ার অবকাশ তৈরি করেননি —

> "--- আর্য প্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহ সুখাভিলাষিনী হইতে লাগিল। এই উচ্চভিলাষশূন্য অলস, নিশ্চেষ্ট গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল।"

সমালোচক বঙ্কিম :

১৯৭৪ সালে আমেরিকা থেকে যখন 'West Book Twentieth Century Criticism প্রকাশিত হল, সেই গ্রন্থে সমালোচনার শ্রেণিবিভাগ হল এভাবে — Formalist Criticism, Genre Criticism, Archetypal Criticism, Historical Criticism এবং Interdisciplinary Criticism. সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে Rereading করতে গিয়ে বারেবারে তাঁর লেখায় 'সমালোচন' শব্দটি পাচ্ছি, ১৮৭৬ সালে বেরুচ্ছে নয়টি প্রবন্ধ নিয়ে 'বিবিধ সমালোচন।'

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি নিয়ে নিজের জবানবন্দীতে বলছেন— "আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচন করি নাই।" 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 'Book Review'- কে বলা হচ্ছে গ্রন্থ 'সমালোচন।' পরবর্তীতে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন —

> "--- অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর গৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ।"

(ক) তুলনামূলক (Comparative Method) সমালোচনা : বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য সমালোচনার তুলনামূলক বিচার পদ্ধতির সার্থক প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্কিম সাহিত্য সমগ্র রূপটি একটা কাঠামোয় এনে তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন 'প্রকৃত ও অপ্রকৃত' প্রবন্ধে, সেখানে মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবম্ কাব্যের হিমালয়ের মনুষ্যোচিত আচরণের সঙ্গে মিল্টনের 'Paradise lost'-এর Satan-এর আচরণের তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সমালোচক-দের চরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে যাহা মনুষ্য চরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না।"

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সমান্তরলতা (Parallelism) বাক্যগঠনে আনলেন বঙ্কিমচন্দ্র —

> "জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্খা ও স্মৃতি। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা---।"

শকুন্তলা-মিরান্দা এবং দেস্‌দিমোনা প্রবন্ধে নায়িকাত্রয়ীর চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের রেখাপাত। বঙ্কিমের মননবিশ্বে মিরান্দা আদর্শ প্রেয়সী। দেসদিমোনা আদর্শ পত্নী, শকুন্তলা সেই দুয়ের সমন্বিত রূপ —

> "শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীব প্রায় গঠন। --- শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরান্দা, অর্দ্ধেক দেসদিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিনী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরিন্দার অনুরূপিণী।"

(খ) প্রজাতিগত বিশ্লেষন (Genre Criticism) বিশ শতকে শিকাগোর Genre Critic এডগার আলসন এস ক্রেম, ওয়াইন বুথ প্রমুখেরা সাহিত্যকে 'Genus' রূপে এবং তার শাখা-উপশাখাকে Species বা প্রজাতি রূপে সংযোগ করে নানা শাখা-উপশাখার সংযোগ, সমষ্টি, এবং পার্থক্য প্রতীতিতে আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিলেন, আমাদের আলোচিত 'গীতিকাব্য'-কে প্রজাতিরূপে ভাবি, তাহলে দেখবো বঙ্কিমচন্দ্র দৃশ্যকাব্য বা নাটকাদি, আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য, এবং খন্ডকাব্য এই তিনশ্রেণির মধ্যে সংযোগ, সম্পর্ক ও পার্থক্যের কথা বলছেন। এই বিশ্লেষন পদ্ধতি 'সমালোচনা' নামক সংরূপে Genre Criticism নামেই পরিচিত। উদাহরণ সহযোগে ব্যাপারটা দেখানো যাক — "মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয় বিধ অধিকার

থাকে, বক্তব্য এবং অবক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।"

(গ) ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতি (Historical Criticism) উনিশ শতকের প্রতীচ্যে তেইন, সঁৎ, ব্যুভ ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতি বা Historical Criticism-এর তত্ত্বকথা ও প্রায়োগিক কৃৎকৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্কিমের সাহিত্য-সমালোচনায় এর চরমতম দৃষ্টান্ত 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের এই পাঠকৃতিতে —

"কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রুপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।" বঙ্কিমচন্দ্র এখানে দেশ ও জাতির অগ্রগমনের সঙ্গে বিবর্তনকে বঙ্কিমচন্দ্র 'কার্য-কারন'-তত্ত্ব প্রস্থানে সন্নিবিষ্ট করে 'ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতি'-র প্রায়োগিক দক্ষতায় উত্তীর্ণ হয়ে যান।

(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পতন্ত্র : (Theory of Fine Arts) : 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হোলো - 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প', যেটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮১-র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্যামাচাতুরী'-র সমালোচনা উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি রচিত হয়। Fine Arts'-কেই বঙ্কিমচন্দ্র 'সূক্ষ্মশিল্প' বলেছেন। চিত্র, স্থাপত্য, নৃত্য, সঙ্গীত, কাব্য - সকলের উদ্দেশ্য 'সৌন্দর্যসৃষ্টি'। এই প্রবন্ধটি সৌন্দর্যতত্ত্ব তথা নন্দনতত্ত্বের আকর বিশেষ। উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকার শিল্পের যে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন তা সম্পূর্ণতই অ্যারিষ্টটলের অনুকরণের সমীপবর্তী। প্রত্যেক মানুষের সৌন্দর্য্যাকাঙ্খা জীবন সাধনার একটা অপরিহার্য অংশ — '--- প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্যে সুখী নহে'। তেমনই সমস্ত শিল্পের লক্ষ্য সৌন্দর্য সৃজন বঙ্কিম বিভিন্ন শ্রেণির শিল্পের সৌন্দর্য 'সৃষ্টির সংজ্ঞার্থে জানান — "যে সৌন্দর্য জননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে। যে বিদ্যার অবলম্বন আকার তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতি-সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য; বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য। যে সৌন্দর্য জনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, সে বিদ্যার নাম নৃত্য, রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত। বাক্য যাহার অবলম্বন তাহার নাম কাব্য।"

অ্যারিষ্টটল ও তাঁর Poetics গ্রন্থে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক ও নান্দনিক পার্থক্য-প্রতীতির ওপর মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'Imitation' বা 'অনুকরণ'-কে সামনে রেখেই অ্যারিষ্টটল এই সমস্ত শিল্পের নন্দনতত্ত্বকে স্পষ্ট করেছেন। অ্যারিষ্টটলের বয়ান — "things as they were or are, things as they are said or thought to be or things as they ought to be" অর্থাৎ বস্তু যা ছিল এবং সেই বস্তু আমাদের মানসলোকে কিভাবে প্রতিভাত হয়, এবং বস্তু কি রকম হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি বলেন — 'Art imitates nature, but nature is imperfect' আর্ট nature অর্থাৎ জীবনও প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। বঙ্কিমচন্দ্রের, সাহিত্যতত্ত্বের বিশেষত্ব এখানেই।

মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রকে বিনির্মান করেছেন নিজস্ব প্রতিভা শক্তির জোরে। মহাকাব্যের আর দু'চারটা নায়িকার মতো দ্রৌপদী নয়, দ্রৌপদী স্বতন্ত্র চরিত্র। সেই স্বতন্ত্রতা বোঝাতে 'দ্রৌপদী-প্রথম প্রস্তাব' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১২৮২ ভাদ্র)
সীতার সঙ্গে তুলনায়নে এমনসব কথা —

> "সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচন্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দ্বিতীয় প্রস্তাব'-এ দ্রৌপদী চরিত্রের বিশদ আলোচনা করেছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপতির সমস্যাকে পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা খুব তাচ্ছিল্য এবং ভারতীয় জাতির সংস্কৃতি নিয়ে বিদ্রূপাত্মক সুর তুলেছিলেন - কিন্তু প্রবন্ধের শুরুতে যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপনিবেশিক মন ও পাশ্চাত্য প্রীতির কথা বলেছিলাম, সাহিত্যতাত্ত্বিক বঙ্কিম সরে গিয়ে স্বদেশব্রতী বঙ্কিম প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন —

> "এই জাতীয় একজন পন্ডিত (Fergusson) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না - সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত। তাই বলিতেছিলাম-এই সকল পন্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্য সংসারে দুর্লভ।"

দ্রৌপদীর পক্ষে সওয়াল করলেন ভারতীয় ধর্মবোধের প্রেক্ষিতে —

> "দ্রৌপদী স্ত্রী-জাতির অনাসঙ্গ ধর্মের মূর্তি স্বরূপিনী" আবার কখনও যুক্তি পরম্পরায় দেখলেন - "পঞ্চপতি দ্রৌপদীর নিকট একপতি পাত্র ও ধর্মাচরণের অভিন্ন উপলক্ষ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনায় 'কৃষ্ণজাতি' প্রবন্ধটি সবিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। কেননা, এই প্রবন্ধে তিনি তৌল করেছেন মহাভারত একজনের লেখা নয়, তিনটি পর্যায়ে মহাভারত রচিত। প্রথমপর্ব দক্ষ কবির রচনা। এই প্রবন্ধটিতে বস্তু নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে। কৃষ্ণচরিত্র বঙ্কিমের হাতে পড়ে ইতিহাস-সমালোচনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে 'দার্শনিক' বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যা বলেছেন তা সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য —

> "প্রভুতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান — 'কৃষ্ণচরিত্র'। কৃষ্ণচরিত্র একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। --- বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমতঃ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন - তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)।"

রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের নামকরণও তাই। এখানেও অ্যারিষ্টটলের Imitation বা 'মিসেসিস' তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক বিচার। বঙ্কিমচন্দ্রের এখানে অকপট স্বীকারোক্তি —

> "অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে। প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে।"

শেষ সিদ্ধান্তে এসে স্মরণ করি প্রখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ, সেই বিচারে আমি সহমত পোষণ করি —

> "--- সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় (ইংরেজিতে হলেও) মধুসূদন বঙ্কিমের পূর্বাচার্য হলেও প্র্যাকটিক্যাল সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমই পথিকৃত --- বাঙলা সাহিত্য বিচারকে যে বঙ্কিম যাবতীয় Myopia বা দৃষ্টিক্ষীনতা ব্যাধি থেকে মুক্ত করেছিলেন তা স্বীকার করতে হয়। এমন কি, কালান্তরে আমরা যখন আজকাল তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করি, তখন একালের পাশ্চাত্য প্রস্তাবের আলোকরেখায় পথ দেখলেও বঙ্কিমের উত্তরাধিকারটুকু অস্বীকার করতে পারি না।" (সাহিত্য সমালোচনা, এসময়, পৃঃ ১২৭-২৮)

গ্রন্থপঞ্জি :

১। ভট্টাচার্য অমিত্র সূদন, 'নবজীবন ও প্রচার এর যোগ : ১৮৮৪-১৮৯১' (বঙ্কিম জীবনী-এর অন্তর্গত) আনন্দ পাবলিশার্স-প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, ১৯৯১
২। দত্তগুপ্ত অক্ষয় কুমার, 'বঙ্কিমচন্দ্র', জিজ্ঞাস, কলকাতা, ০৯, ১৯৭৫
৩। প্রমথ বিশী সম্পাদিত, 'সাহিত্য চিন্তা', অমর সাহিত্য প্রকাশন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।